ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের ‘হাট’ অনুসঙ্গ

ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, পঃবঃ।

প্রবন্ধসার

গ্রাম্য লোকজ জীবনবৃত্ত বারে বারে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে। গ্রাম্য জীবনে হাট অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা। পল্লীভারতের বেঁচে থাকার রসদ আসে এখান থেকে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে এই হাট প্রসঙ্গটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেননা মথুরার হাট প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে রাধাকৃষ্ণের প্রেম মাহাত্ম্য বর্ণনা হয়েছে। এই কাব্যের লৌকিক আদর্শটিও অনেকাংশে হাটে যাত্রাকালের ঘটনাকেন্দ্রিক। তাই এখানকার হাট প্রসঙ্গ আলোচনা বাংলা সাহিত্য, এমনটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাট প্রসঙ্গ বেশ গুরুত্ব পেয়েছে, যার উৎস হিসাবে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে দেখি।

চর্যাপদের পরই বাংলা ভাষার পরবর্তী নিদর্শন বড়ুচণ্ডী দাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য। সাহিত্যমূল্য ও রস আবেদনে যে কাব্যের পঠন গুরুত্ব ও আলোচনার নানান দিগন্ত আজ শতবর্ষ পেরিয়েও ফুরিয়ে যায়নি। বরং বাংলা ভাষা চর্চা ও সাহিত্যের আলোচনায় এই কাব্যটি সমানে জনপ্রিয় এমনকি, ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সরস আদি নাটকীয় কাব্য কাহিনীটির নানান দিক নিয়ে চর্চা-সমালোচনা এমনকি, আলোচনারও শেষ নেই। বিশিষ্ট ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তাই বলেছেন –

> ‘‘নানা দিক হইতে Middle English বা মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যের বিচার করিলে মহাকবি Geoffrey Chaucer-এর (জীবনকাল ১৩৪০-১৪০০ খ্রিঃ) যে মহত্ত্বপূর্ণ স্থান– মধ্যকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও সেই স্থান। সেই জন্যই ইহার পঠন-পাঠন ও আলোচনা বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের অপরিহার্য।’’

তাই এই কাব্যের অনুশীলন ও চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে আসে ‘হাট’ যাত্রার অনুসঙ্গটি। সমগ্র বৃন্দাবনবাসীদের বেচা-কেনা ও ভাবের আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল হিসাবে এই কাব্যভূমিতে বার বার করে উঠে এসেছে মথুরার হাট অনুসঙ্গ। যে হাটের রূপকে নিঃসঙ্গ মানব জীবনের দুঃখ-ব্যথাকে ফোটাতে গিয়ে কবি বলেন –

> ‘‘হাটে হাটে আমি ঘুরি সারাদিন নহে সে করিতে হাট,
> হাটের যত দুঃখ-ব্যাথা জানায় শূন্য মাঠ।’’

— আসলে ‘হাট’ হল ঐ মানব জীবনের অন্যতম একটি তীর্থক্ষেত্র, মিলন ভূমিও। যেদিন থেকে মানুষ নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্র বিনিময় প্রথারূপে ক্রয়-বিক্রয় করতে শিখেছে, সেদিন থেকেই ক্রমে হাটের সূত্রপাত ঘটেছে। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। অনেক বিবর্তন ঘটেছে মানব সভ্যতার। কিন্তু ‘হাটে’র প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও ফুরিয়ে যায়নি। বরং ‘হাট’ তার একই চেহারা নিয়ে মানব জীবনে ক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘হাট’ই মানব জীবনের প্রাণকেন্দ্র। ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রস্থল ঐ ‘হাট’। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও সেই হাট জীবনের ছবি দৃশ্য থেকে দৃশ্যায়িত হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য মধ্যে ‘হাট’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সমাজ জীবনের

প্রাণকেন্দ্রে বিশেষতঃ 'চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সেই 'গোলাহাটে'র ভূমিকাও কম যায় না।

আসলে, সমাজের প্রতিবিম্বন হিসাবে সাহিত্যে 'হাট' জীবনের ভূমিকাকে এড়িয়ে থাকা কিম্বা, অস্বীকার করতে পারেননি কোনো যুগেরই কোনো কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকগণ। তাই সর্বযুগের শিল্প সাহিত্যে মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে 'হাট' অনুসঙ্গ সেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের যুগ থেকে আধুনিক কালের সাহিত্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাই শতবর্ষ পেরিয়েও আলোচ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বিচিত্র এক সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠা 'হাট' জীবনের ছবির রসদ আজও পাঠক সমাজে সমান জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। সমগ্র কাব্য কাহিনীর নাটকীয় চমকতা সৃষ্টিতে 'হাট' অনুসঙ্গ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা, ঐ কাহিনীর আলোকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল ঐ রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলা ক্ষেত্রে নয়, গোপ-গোয়ালিনী জীবনের নর-নারীদের জীবন-জীবিকার প্রাণকেন্দ্র হিসাবেও হাটের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গোকুলের পথ ধরে যমুনা পেরিয়ে গোপ-গোয়ালিনী ঘরের নারীদের মথুরার হাটে যাত্রার এক দীর্ঘ জার্নির ছবি রচনা করেছেন বড়ু চন্ডীদাস। ঐ মথুরার হাটে যেন কোনো এক দুর্বার আকর্ষণে বার বার তাদের টেনে নিয়ে গেছে। দধি-দুগ্ধ সঙ্গে করে গোপ-গোয়ালিনী ঘরের নারীদের ঐ হাটের পথে পদ-যাত্রার নিক্ক-ধ্বনি সমগ্র কাব্য ভূমিতে বার বার শোনা যায়। যে হাট যাত্রার ছবির ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে, এই সমগ্র বিশ্ব-সংসারের বেচা-কেনার হাটের রূপকতায় সমগ্র কাব্য কাহিনী যেন ঝল্সে উঠেছে বড়ু চন্ডীদাসের কবিত্ব প্রতিভাগুণে। সমগ্র ঐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-কাহিনীর আলোকে খুঁজে দেখা যেতে পারে, কিভাবে এই কাব্য-কাহিনীর গতিপথে 'হাট' অনুসঙ্গ এক গুরুত্ব পূর্ণ-ভূমিকা পালন করেছে।

— 'তাম্বুল' খন্ড থেকেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'হাট' অনুসঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে। যে হাটকে কেন্দ্র করে গোপ-গোয়ালিনী ঘরের নারীদের হাটের পথে যাওয়া ও আসার সেই পদযাত্রার নিক্কন ধ্বনি বার বার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। যদিও এর পূর্বে তথা , ঐ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আদি খন্ড হিসাবে 'জন্মখন্ডে'র কাহিনী শেষে দেখা গেছে — আইহনের মা অনেক ভেবে চিন্তে তার পুত্রবধূ রাধিকাকে হাটে-বাটে নানাভাবে রক্ষা করার জন্য পদ্মার পিসিকে এনেছেন। ঐ বৃদ্ধাই হল রাধার দূতি তথা, বড়াই। মূলকাব্যে তাই শোনা যায় —

'নিয়োজিলি নানা পরকারে। আল।।
হাটে বাটে রাধা রাখিবারে। ল বড়ায়ি।।'

রাধা তার ঐ দূতি বড়াই বুড়ি সহ সখীদের সঙ্গে নিয়ে দধি-দুধ পসরা সাজিয়ে, সেই পসরা নেতবস্ত্রের ঢেকে আনন্দ বিহ্বল মনে মথুরা নগরের হাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঐ যাত্রাকালে পথিমধ্যে রাধা বড়াইকে হারিয়ে ফেলে। সখীদের সঙ্গে রঙ্গপরিহাসে প্রমত্ত রাধা, বৃদ্ধা বড়াইয়ের মন্থর গতিতে হাঁ টাকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেনি। তাই তাকে পিছনে ফেলে রাধা বকুল তলায় পৌঁছে গেছে। বড়াই ও রাধাকে হারিয়ে ফেলে বনপথে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরেছে। ঐ বনমধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হলে - বড়াই, রাধার সন্ধান জানতে চেয়েছে। কৃষ্ণও কায়দা করে রাধা কিরূপ দেখতে সেই চেনার আছিলায় তার রূপের বর্ণনা জেনে নিয়েছে। বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যেন-তেন প্রকারে ঐ রাধাকে লাভ করার। যেহেতু রাধা প্রতিদিন মথুরার হাটে দধি-দুধ বেচতে যায়, সেই হেতু বড়াইকে হাত করে কৃষ্ণ রাধার প্রতি প্রেম প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষ্ণ তাই তাম্বুল সহযোগে রাধাকে ঐ বড়াই মারফৎ প্রেম-প্রস্তাব দেয় বলে, এই খন্ডের নাম 'তাম্বুল খন্ড'। এভাবে, প্রতিটি খন্ডের কাব্য-কাহিনীর অনুসঙ্গে দেখা যাবে ঐ মথুরার হাটে যাত্রাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যবর্তী সম্পর্কের রহস্যময় নাটকীয়তা। হাট যাত্রাকে

উদ্দেশ্য মাত্র করেই রাধা-কৃষ্ণের ঐ দ্বন্দ্ব মধুর প্রণয়চিত্র, নাটকীয়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিশিষ্ট সমালোচক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এই নাটকীয় কাব্য-কাহিনী নির্মাণে 'কবির ভূমিকা' প্রসঙ্গে বলেছেন—

......'সাধারণভাবে প্রায় প্রতি খন্ডেই মথুরার হাটে যাইবার কাহিনীই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে
সংলাপ মাধ্যমে রূপায়িত, আর দেখা যাইতেছে হাট হইতে ফিরিবার কাহিনী অতি
সংক্ষিপ্ত - কবির বিবৃতি মূলক একটি বা দুইটি মাত্র পদে ব্যক্ত।' -(পৃঃ ৬০)

শ্রীরাধা ঘৃণাভরে কৃষ্ণের ঐ প্রেম প্রস্তাব কেবল প্রত্যাখ্যানই নয়; বড়াইকে এমন গর্হিত কাজের জন্য অনেক তিরস্কারও করেছে। তাই চরম অপমানিতা বড়াই প্রতিশোধ স্পৃহায় কৃষ্ণের কাছে এসে বলেছে,

'নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ
তাক দুখ দিতেঁ কিছু চিন্তহ উপাএ।।'
-(পৃঃ ২০০)

অর্থাৎ, রাধা প্রতিদিন মথুরার হাটে যায় দধি বিক্রির জন্য। তাকে কিভাবে দুঃখ তথা, শাস্তি দেওয়া যায়, সেই উপায় বের কর। —

বড়াইয়ের কথা মতো রাধাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ তাই মনে মনে পরিকল্পনা করে, যমুনা নদীর তীরে কদম্বের তলায় কিভাবে দানের ছলে রাধাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। কৃষ্ণ যাতে রাধাকে শাস্তি দিতে পারে, কৃষ্ণকে সেই সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বড়াই রাধাকে ফের মথুরার হাটের উদ্দেশ্যে দধি-দুধ নিয়ে বেরোবার জন্য উৎসাহিত করে। মথুরার হাটে যাওয়ার পথে কৃষ্ণ বারবার রাধাকে বিরক্ত করে। তাই রাধা আর ঐ হাটের পথে পা'রাখতে চায় না। এজন্যে বড়াই তাকে ছলনা করে বোঝায়, ঐ দুষ্টু কৃষ্ণ তার দুর্মতি পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে গেছে। সুতরাং এবার থেকে নির্দিধায় রাধিকা হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে। এতক্ষণে বড়াইয়ের কথায়; —

'সব গোপী ল আঁ রাধা (১৪/২)
করি বিমরিষে।
মথুরার হাট জাই উ চিত্তের হরিষে।।
....
মথুরা চলিলি রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সখিগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে।।
রাধা ল আঁ দধি দুধ বিকিনি আঁ হাটে।
ঘরক আইলী বড়ায়ি অতি বড় ঝাঁটে।।'
—(পৃঃ ২০১)

এভাবে, বড়ু চন্ডীদাস রাধার প্রতিদিন মথুরার হাটে দধি-দুধ বিক্রয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। যে হাট থেকে ঐ দধি-দুধ বিক্রয়ের সমূহ অর্থ রাধা তার শাশুড়ীর হাতে তুলে দেয়। অর্থাৎ ঐ মথুরার 'হাট'ই সমগ্র বৃন্দাবনবাসীর জীবনধারণের প্রাণকেন্দ্র। গোপ-গোয়ালিনী ঘরের বধু হিসাবে রাধা তাই সংসারের হাল ফেরাতে তথা, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যে ঐ হাটের পথে রোজ পা'বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। গোকুল নগর থেকে পায়ে হেঁটে যমুনা নদী পেরিয়ে একেবারে সোজা মথুরা নগরের হাট। যে হাটে রাধা তার দধি-দুধের পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। সেই হাট থেকে দিনের শেষে ফিরে এসে ঐ দধি-দুধ বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অর্থ রাধা তার শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়ে পরম তৃপ্তি উপভোগ করে। তার ঐ পথের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে যায় -শাশুড়ির মুখে খুশির হাসি দেখে। রাধার অধিকাংশ সময় কেটে যায় ঐ হাটের মধ্যে। শুধু রাধা কেন, রাধার সহচরী সমস্ত গোকুল নন্দিনীদের জীবনপ্রবাহ ঐ হাটের সঙ্গে বাঁধা। ঐ হাটের উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নে যাত্রা করে দধি-দুধ বিক্রয় শেষে তারা গৃহে ফেরে একেবারে অপরাহ্নে। দিনের সমস্ত সময়টা গোপগোয়ালিনী ঘরের নারীদের কেটে যায় ঐ হাটের মধ্যে, তাদের বেচা-কেনার খেলায়। সমগ্র এই মানব জীবন প্রবাহটাই যেখানে একটা ঐ বেচা-কেনার খেলা রূপ মস্ত 'হাট'। এই যে 'জীবনের হাট' আর ঐ 'মথুরা নগরের হাট' দু'ই যেন মিলে-মিশে একাকার সমগ্র কাব্য-কাহিনীর রূপক

ভাবনায়।

এরপর 'দানখন্ডে' কৃষ্ণ বনপথে রাধার সঙ্গে বলপূর্বক মিলিত হলে, বধুর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আইহন জননী ও সন্দেহ বশতঃ বধুকে আর মথুরার হাটে যেতে নিষেধ করেন। রাধা তাই দীর্ঘদিন ঐ দধি-দুধ বেচার উদ্দেশ্যে মথুরার হাটে বের হয়নি। রাধাকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আহার-নিদ্রা সব ত্যাগ করে কৃষ্ণ, রাধা বিহ্নে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বড়াইকে তার মনের অবস্থা বলে, রাধিকাকে ঘরের কোন থেকে পুণরায় মথুরার হাটের পথে বের করে আনার অনুরোধ করে। বড়াই বুড়িও কৃষ্ণের ঐ ব্যাকুল অবস্থা দেখে কথা দেয়, এবার থেকে বার বার রাধাকে ঐ মথুরার হাটে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে। বড়াই ছলনা করে রাধার শাশুড়ীকে বোঝায় – গোপ-গোয়ালিনী ঘরের বধু হয়ে যদি হাটে আর না যায়, তবে গোয়ালিনী ঘরের মান বাড়ে কি ? তাছাড়া, রোজ-রোজ বেচা-কেনা না হলে গোয়ালীর ধন বাড়বে কি করে ? এমনকি, এভাবে দীর্ঘদিন বেচা-কেনা বন্ধ থাকলে, সমস্ত দধি-দুধ ঘরে পচে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই গোয়ালা ঘরের অন্যান্য 'বৌ-ঝি'দের মতো রাধাকেও রোজ রোজ ঐ মথুরার হাটে বের হওয়া উচিৎ। 'তাম্বুল খন্ডে'র ৩৪সংখ্যক পদে তাই দেখা যায়, বড়াই আইহনের মায়ের অনুমতি এনে দিলে, –রাধা পুনর্বার আনন্দ বিহ্বল চিত্তে হাটে যাওয়ার জন্য –

'ঘৃত-দধি দুধ ঘোলেঁ সাজি (১৫/২) আঁ পসার' (৩৫ সংখ্যক পদ) – প্রস্তুতি শুরু করে। —

'দানখন্ডে' এসে দেখা যায়, কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে রাধাকে পূনর্বার বিপর্যস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে দাণীর বেশে বসে রয়েছে। কৃষ্ণ মনে-মনে মতলব আঁটে, রাধা যেহেতু প্রতিদিন যমুনা নদী পেরিয়ে ঐ মথুরার হাটে দধি-দুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে যায়; অথচ, কোনোদিন সে কারোর কাছে ঐ দ্রব্যের 'দান' দেয়নি। তাই, আজ কৃষ্ণ স্বয়ং মহাদানীর বেশে রাধার কাছে মহাদান চেয়ে বসবে। রাধাকে বিপাকে ফেলতে কৃষ্ণ তাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছে তার ঐ আগমনের কারণ —

'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজ ঘরে।
তো কারণে আইলোঁ মো এঁ যমুনার তীরে।।' (৪৪ সংখ্যক পদ)

অর্থাৎ, রাজার কাছে পথের শুল্ক এবং হাটের শুল্ক আদায় করবার ভার নিয়েছি। তাই যমুনার কুলে এসেছি। দানীর বেশী কৃষ্ণ শুধু ঐ রাধার পণ্য দ্রব্যের উপর দান ধার্য করে ক্ষান্ত থাকেনি। রাধার প্রতিটা অঙ্গের জন্যও আলাদা -আলাদা দান চেয়ে বসে। নিরুপায় এবং হতবাক রাধা তাতে শুধায়; –

'নিতি নিতি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্ন ত্রঁ তোঁ আগোলসি বাটে।।'
(৪৬ সং পদ পৃঃ ২০৯)

অর্থাৎ, সে প্রতিদিন হাটে দধি বিক্রি করতে যায়, অথচ কেউ তাকে এতদিন দান চায়নি। কিন্তু আজ কেন অহেতুক দানের অজুহাতে তার পথ রোধ করেছে ? এ জন্য রাধা কংস রাজের কাছে নালিশ জানাবে বলে কৃষ্ণকে ভয় পর্যন্ত দেখায়। যাতে কংসরাজ তাকে ধরে নিয়ে যায়। কারণ, কৃষ্ণের ঐ পথ রোধের কারণে রাধা হাটে যেতে না পারলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। আসলে,

'অনেক কড়ীর পসারা।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা।।'
(৫০সং পদ)

অর্থাৎ, অনেক মূল্যের পসারা। অথচ, রাধা সেই পসরা নিয়ে হাটে যেতে পারল না। তাই নিরুপায় রাধার ঐ স্বয়ং কংস রাজকে নালিশ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কৃষ্ণও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে রাধার ঐ কথায় বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি, কিম্বা ঘাবড়েও যায়নি। বরং উল্েজারের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণ বলেছে, – 'বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাত্রিঁর দান বটে।' অর্থাৎ, পথে ঘাটে বাজারে সর্বত্রই কৃষ্ণের ঐ দানের অধিকার রয়েছে। (৮৩ সং পদ/পৃঃ ২৩০) এভাবে প্রবল জেদী কৃষ্ণ রাধাকে বিনা দানে কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। তার সব সখীদের ছেড়ে দিলেও রাধাকে কিছুতেই কৃষ্ণ বিনা দানে

ছাড়তে নারাজ। কৃষ্ণকে অনেক অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ রাধা দুঃখে-হতাশায় কৃষ্ণের প্রতি বলেছেঃ

'জাই বার না দিলি মথুরার হাটে ল। দান ছলে রোন্দসি বাটে।।

গোপীজন সঙ্গে আম্মে ছছন্দে বুলিলোঁ ল বিকোজাও মথুরার হাটে।।

মো কেহ্নে জানি বোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মহাদানী ল কাল ভৈল যমুনার বাট।' (পৃঃ ২৩০)

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের হাত থেকে পরিত্রান না পেয়ে রাধা আপশোষ করেছে। হাটে আর দধি বিক্রিতে বের হওয়ায় শাশুড়ির মত একেবারে ছিল না। শাশুড়ী পূর্বেই তাকে নিষেধ করে বলে ছিল, –

'উ বেলি না জাই হ মথুরার হাটে ল।'

– (৯৯ সং পদ পৃঃ ২৩৮)

গুরুজনের সেই নিষেধ বাক্যই রাধার জীবনে ফলে গেছে। আজ সে ঐ ধূর্ত কৃষ্ণের কাছ থেকে ছাড়া পেতে পেতেই হাটের সময় ফুরিয়ে যাবে। এতগুলো দধি-দুধ নষ্ট হবে। হাট থেকে দধি-দুধ বিক্রির কড়ি নিয়ে ফিরতে না পারলে স্বামী শাশুড়ীর কাছে সে কি জবাব দেবে! তাই রাধা ঐ কৃষ্ণের প্রতি কাকুতি-মিনতি করে বলেছেঃ

'ঘৃত দুধ ল আঁ যাওঁ মথুরার হাট।

খানি এক ছাড়ি আঁ কাহ্নাঞি মোরে দেহ বাট।'

(১০২ সং পদ/পৃঃ ২৪০)

কিন্তু কৃষ্ণের এক গুয়েমির কাছে সব অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ। বড়াই তাকে পরামর্শ দেয় কৃষ্ণকে চুম্বন-আলিঙ্গন দিয়ে শান্ত করার। তাছাড়া, কৃষ্ণের প্রেম লাভ যে করে সে ত মহা পুন্যবান। মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করে সে স্বর্গে ঠাঁই পায়। কিন্তু বড়াইয়ের পরামর্শও রাধা কর্ণপাত করেনি। রাধা বনের অন্যপথ ধরে পালানোর চেষ্টা করলে, কৃষ্ণ তার সঙ্গে জোর পূর্বক ঐ বনের মধ্যে মিলিত হয়। শরীরের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে বড়াই কৌতুহল প্রকাশ করলে, রাধা নির্দিধায় কৃষ্ণের সমস্ত আচরণের কথা অকপটে ব্যক্ত করে।

এরপর 'নৌকাখন্ডে' এসে দেখা যায়, বনপথের ঐ ঘটনার পর, রাধা দীর্ঘদিন আর দধি-দুধ নিয়ে হাটের পথে বের হয়নি। আইহন জননীও পুত্রবধূকে এবার হাটে যাওয়ায় কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। এদিকে রাধাকে দীর্ঘদিন না দেখতে পেয়ে, কৃষ্ণের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ, আবার রাধাকে কাছে পাওয়ার জন্য-বড়াইকে কাকুতি-মিনতি করে বলেছে, —

'আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।

দধি দুধ বিচি নি আঁ মথুরার হাটে।।'

– (১৪৮ সং পদ/পৃঃ ২৬৪)

অর্থাৎ, আমার জন্য রাধাকে মিথ্যা করে বলো, দধি-দুধ বিক্রয় করাতে মথুরার হাটে যাই। বড়াইও ঠিক করেছে, কৃষ্ণ ভয়ে ভীতা রাধাকে রাজী করাত সে রাধাকে এবার অন্যপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেবে। এমন আশ্বাসে রাধা নিশ্চিত রাজী হবে। এই ভরসায় বড়াই কৃষ্ণকে আশ্বস্ত করে বলেছে, —

'আহ্মে রাধা ল আঁ যাইব মথুরার হাটে।

না অ ল আঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে।।'

(পদ সং - ঐ)

অর্থাৎ, আমি রাধাকে নিয়ে মথুরার হাটে যাব, তুমি যমুনার ঘাটে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা কর। বড়াইয়ের এই আশ্বাসে কৃষ্ণ সোল্লাসে দ্রুত যমুনার ঘাটে গাছ কেটে নৌকা বানাতে লাগে। একটা বড় নৌকা তৈরি করে সেটা জলের তলায় লুকিয়ে রেখে, আরও একটি ছোট্টো ডিঙি নৌকা তৈরী করে জলে ভাসায়। যে নৌকাতে দু'জনের বেশি ভার বহন করা একেবারে সম্ভব নয়। আর এদিকে বড়াইও রাধাকে হাটের পথে বের করার জন্য বুঝিয়ে বলেছেঃ

'রুবুদ্ধি তেজি আঁ চল মথুরার হাটে।

এবার তোহ্মারে আম্মে নিব আন বাটে।।'

– (১৫২ সং পদ/পৃঃ ২৬৬)

এভাবে, বড়াই রাধাকে মথুরার হাটে যাওয়ার

জন্য বার বার উৎসাহিত করতে থাকে। রাধাকে অন্য পথে নিয়ে যাওয়ার আশ্বস্ত করে বলেছে – যমুনা নদীতে রাজা এখন নৌকা রেখেছে, সেই নৌকাতেই তারা পার হয়ে মথুরার হাটে যাবে। শুধু এই নয়, আইহনের মায়ের কাছ থেকেও বড়াই কৌশলে অনুমতি আদায় করে নেয়। পরদিন প্রভাতে ঘি-দধি-দুগ্ধ সমেত পসরা সাজিয়ে ষোলশত গোপিনীসহ রাধা মথুরার হাটের পথে পুণরায় যাত্রা শুরু করে। যমুনার ঘাটে গিয়ে মাঝিহীন খালি নৌকা ভাসতে দেখে, সকলে পসরা নামিয়ে মাঝিকে ডাকা ডাকি করে। ঐ হাঁক-ডাকে মাঝির বেশে স্বয়ং কৃষ্ণ উপস্থিত হয়। তার নৌকা এক্কেবারে ছোটো। দু'জনের বেশি তিনজন ভার নেওয়ার ক্ষমতা নৌকার নেই। তাই সব সখীকে এক এক করে পার করে দেয়। এমনকি, বড়াইকেও পার করে দেয় ঐ ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। কিন্তু, একেবারে শেষে রাধাকে পার করতে গিয়ে কৃষ্ণ মহাদান চেয়ে বসে। রাধা ঐ দান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করলে, কৃষ্ণও পার করে দিতে অসম্মতি জানায়। কৃষ্ণ ঐ দানের আছিলায় রাধাকে বিপর্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করে। এভাবে সময় নষ্ট হলে, রাধারই ক্ষতি। কারণ হাট ভেঙে গেলে সমস্ত দধি-দুধ নষ্ট হবে। তাই রাধার সকাতর অনুরোধে.

'শুন ঘাটিআল না অ চালায়ি আঁ ঘাটে।
সম্মা পার কর যাইউ মথুরার হাটে।।'
—(১৫৫ সংপদ/পৃঃ ২৬৮)

কিন্তু, কৃষ্ণ ঐ বড়াই সহ সব সখীকে পার করে দিলেও, রাধাকে বিনা দানে পার করে দিতে কিছুতেই রাজী নয়। কৃষ্ণের স্পষ্ট জবাব –

'কাহ্নাঞি প্রবেধি আঁ হাটক যা'
(১৫৭ সংপদ)

এতক্ষণে রাধা ঐ ঘাটোয়ালের আসল স্বরূপ চিনে ফেলেছে। ঘাটোয়ালের কু-প্রস্তাবে রাধা ঐ মাঝি রূপী কৃষ্ণের আসল স্বরূপ চিনতে পারে। আর তাই তার আপশোষেরও শেষ নেই। আত্মবিলাপের সুরে রাধা তাই বলেঃ

'কি ভৈল কি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরার হাটে।।'
(১৫৮ সংপদ)

এমন করে বার বার রাধার ঐ ধূর্ত কৃষ্ণের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়াকে – এ তার পূর্বজন্মের কর্মফল বলে মনে করে। গোয়ালার কুলে জন্মলাভের কারণেই ত তাকে এমন রোজ রোজ ঐ —

'তঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে'
(১৫৮ সং পদ/পৃঃ ২৬৯)

শুধু তাই নয় তীব্র ভাষায় রাধা গালমন্দ করে কৃষ্ণকে। তার ঐ কু-ব্যবহার সংযত করার জন্য সাবধান করেছে। কৃষ্ণ মথুরার হাটে যাওয়ার পথে রাধাকে এমন বার বার করে বিরক্ত করে কেন ? কি তার অপরাধ ? কৃষ্ণের প্রতি রাধার তাই বিজ্ঞাসা; —

'কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে
জাইবোঁ ঝাঁট মথুরার হাটে।।'

কিন্তু কৃষ্ণের ছলনার কাছে রাধা শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ধরা দিতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণ ইচ্ছা করে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জল কেলি করে। জলে ডুবে যাওয়ার ভয়ে অসহায় রাধা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কাছে আত্মদানে সম্মত হয়। আবার, ঐ মথুরার হাট থেকে ষোলশ গোপিনীসহ বড়াই ও রাধা, দধি-দুধ বিক্রি শেষে বাড়ীর পথ ধরে। এবার ঐ ফেরার পথে কৃষ্ণ তার বড় নৌকায় করে সমস্ত গোপিনীকে একসঙ্গে পার করে দেয়। এভাবে, গোপ-গোয়ালিনীদের 'হাট' গমনকে কেন্দ্র করে 'নৌকাখন্ডে'র কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। এই খন্ডের কাহিনীর সূত্রপাতে 'হাটে'র ভূমিকা হিসাবে সমালোচক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্যের স্থিতধি মন্তব্যটি স্মরণীয় —

'নৌকা খন্ডের মূল ঘটনা ঘটিয়াছে রাধা ও তাহার সখীদের মথুরার হাটে যাইবার পথে। এবং সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত হইয়াছে বা অভিনীত হইয়াছে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের দ্বারা। কিন্তু মথুরার হাট হইতে ফিরিবার

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

কাহিনী এই একটি মাত্র পদে বিবৃত করিয়া
কবি কাহিনীকে অতি সহজেই যথেষ্ট সংহত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।' (পৃঃ ৬০)

সুতরাং ঐ হাটে'র পথে যাত্রাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাব্যের কাহিনী এমন নাটকীয় ভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'হাট যাত্রা'ই ঐ সমগ্র কাব্য-কাহিনী নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'হাট জীবন'ই তাই সমগ্র কাব্য-কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে।

এরপর 'ভারখন্ডে'র কাহিনী পটে 'হাট' অনুসঙ্গে এসে দেখা যায়, বড়াইয়ের কাছে কৃষ্ণ সকাতর অনুরোধ করে, যাতে রাধাকে পুণরায় কাছে পায়। কিন্তু রাধাকে সহজে তার শাশুড়ী হাটের পথে বের হতে দেয়নি। রাধাও ধূর্তকৃষ্ণের ছলনায় বার বার ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভয়ে আর ঐ হাটের পথে পা' বাড়াতে চায়নি। বড়াই পুণরায় যাতে রাধাকে ঐ মথুরার হাটে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, পথে বের করে আনতে পারে সেই আকুলতায় কৃষ্ণ তাকে কথা দেয় –

'আম্মে রাধা ল আঁ জাইউ মথুরার হাটে।।
এহি পরকারেঁ তোর পুরিব আশে।' (১৭৮ সং পদ/পৃঃ ২৮০)

কৃষ্ণের এমন উৎসাহদানে বড়াই রাধাকে বোঝায়, এখন যেহেতু শরৎকাল; তাই পথে বহুলোকের সমাগম। সুতরাং এত লোকের মাঝে কৃষ্ণ আর বিরক্ত করার সাহস পাবে না। এমন স্থির যুক্তির সঙ্গে কেবল ঐ রাধাকে নয়; বড়াই তার শাশুড়ীকে পর্যন্ত যুক্তি দেখিয়ে বলেছেঃ

'গোয়ালের কুলে রাধা জরম (৮৭/২) লভি আঁ।
দধি বিকে জাএ থাক এ বসি আঁ।।
....
আপনে বহুক বোল হাট জায়িতেঁ তোম্মে।
একে করেঁ সম্মা লয়াঁ জাইব আম্মে।।'
–(১৮০ সং পদ/পৃঃ ২৮১)

অর্থাৎ, গোয়ালার বংশে জন্মেও দধি-দুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে ঐ মথুরার হাটে না গিয়ে রাধা কেন ঘরে বসে রয়েছে ? দিনে দিনে ঘরে দধি-দুধ জমে উঠছে। সুতরাং বধুকে হাটে যেতে বলো। সকলকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। এভাবে, বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় রাধা পুণরায় ঐ হাটে যাওয়ার অনুমতি পায়। শাশুড়ির নির্দেশ আর ঐ বড়াইয়ের কথায় ভরসা করে আবারও মথুরার হাটে বিক্রির জন্য রাধা —

'পসার সাজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী।'

এবার সত্যি সত্যি বিনা বাধায় রাধা পথ চলতে থাকে। এমনকি, আনন্দ বিহ্বল চিত্তে যমুনা নদীও পার হয়ে যায়। কিন্তু যমুনা পেরিয়ে রাধা আর ঐ দধি-দুগ্ধের ভার নিয়ে পথ চলতে পারছে না। শরৎকালের প্রখর রৌদ্রে সে হাঁফিয়ে পড়ে। এভাবে পথ চললে, হাটে পৌঁছাতেও অনেক দেরী হয়ে যাবে। কারণ, ঐ মথুরার হাটের পথ তো আর কম দূর নয়। রাধা সেই গোকুলের পথ ধরে দীর্ঘ বনপথ পেরিয়ে বকুলতলা, তারপর ঐ বকুলতলার দীর্ঘপথ পেরিয়ে কদমতলা হয়ে এগিয়ে গেলে তবেই পড়বে যমুনা নদী। ঐ যমুনা নদী পেরিয়েও অনেকখানি কদমতলার পথ ধরে তাকে হেঁটে যেতে হবে। তারপর তরুতলের পথ হয়ে আরো দীর্ঘ পথ এগিয়ে গেলেই পড়বে মথুরা নগর ও সেই মথুরা নগরের 'হাট'। সমালোচক ঐ যমুনার দুই পারের দুই ভূখন্ডকে নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

'যমুনার একপারে গোকুল বৃন্দাবন,
অপর পারে মথুরা।' — অধ্যাপক, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১২৯)।

* একটি ভৌগোলিক চিত্রের মাধ্যমে ঐ মথুরা নগর ও মথুরার হাটের অবস্থান দেখা যেতে পারে।

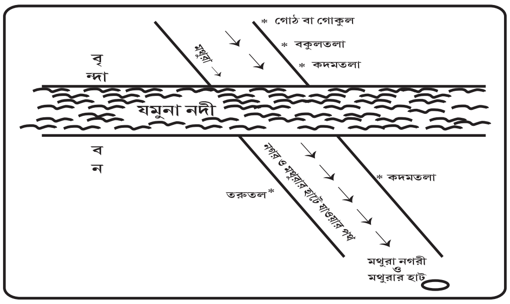

বৃন্দাবনের ওপারের ঐ সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে মথুরার হাটে যাত্রা প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ সমালোচক তাই মন্তব্য করে বলেছেন,

'বৃন্দাবনের ওপারের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিলে তবে মথুরা নগরে বা মথুরা হাটে পৌঁছানো যায়। রাধা সম্বন্ধে বলা হয়েছে; – 'নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বনপথে মথুরা নগরী।।' অর্থাৎ রাধাকে প্রতিদিনে পথ-পরিক্রমা কম করিতে হয় না।

প্রথমে গোকুল হইতে যমুনা। তাহার পর যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনের সুদীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করিয়া মথুরায়, এবং একই পথে মথুরার হাট হইতে পুণরায় গোকুলে।'

— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (পৃঃ ১২৯)।

সুতরাং হাটে পৌঁছানোর ঐ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে না পেরে রাধা একটা 'মজুরিআ' খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ সুযোগ বুঝে নারীর বেশে উপস্থিত হয়। রাধার নির্দেশ মতো কৃষ্ণকে দধিভার বইতে হয়। যে স্বয়ং পৃথিবীর ভার বহন করে, তাকে বইতে হবে সামান্য ঐ দধিভার ? কৃষ্ণ তাই সঙ্কোচ বোধ করে। ভার মাটিতে রাখতে গেলে রাধা বলে

'মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ কান্ধে করভার।
হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার।।'
(১৮৬ সংখ্যক পদ)

কিন্তু, ঐ ভার কাঁধে নেওয়ার অভ্যাস নেই কৃষ্ণের। তাই ভার কাঁধে পথ চলতে গিয়ে কিছু দুধ চলকে মাটিতে পড়লে, তা দেখে কৃষ্ণের বুকে 'ঘা অ দিল রাহী'। – তাই কৃষ্ণ ঐ ভার বইতে অসম্মত হল। কিন্তু রাধা ঐ নারীর ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে শাসিয়ে বলেছে – ভার কাঁধে না নিলে, তাকে পাওয়ার আশা চিরদিনের জন্য ছাড়তে হবে। ভার বওয়ার অনিচ্ছা দেখে চিন্তিত রাধা সময়ে হাটে পৌঁছোবার কথা ভেবে কৃষ্ণকে বলেছেঃ

'প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কতখনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে।।
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী।
লইবে না লইবে ভার সুন্দর মুরারী।'
(১৮৮ সংখ্যক পদ)

অর্থাৎ, এই যমুনার ঘাটেই এক প্রহর বেলা বয়ে গেল, মথুরার হাট আর কখন যাব ? ঘৃত দুধ নষ্ট হল, দধি টক হয়ে গেল, গোয়ালিনী সখীরাও সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল। ভার বইবে কি – না বল। রাধা এভাবে কৃষ্ণকে পুণরায় ভার কাঁধে তুলে নিতে বলে।

'ভার ল আঁ জাএ কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
রাধাক বুইল নারদ বসি আঁ বাটে।।'
(২০১ সংখ্যক পদ)

রাধার কাছে মিলনের আশ্বাস পেয়ে কৃষ্ণ পুণরায় ভার কাঁধে তুলে নেয়। তারপর প্রফুল্ল চিত্তে মথুরার হাটে ভার নিয়ে পৌঁছে যায়। তারপর, —

'হাটে নাম্বাইল দধিভার।
বিকী ভৈল সকল পসার।।
....
সুন ভার (৯৯/২) পেলাই আঁ হাটে।
রাধা সঙ্গে জা এ বাটে বাটে।।'
(২০৫ সংখ্যক পদ)।

এভাবে, পসার বিক্রির পর রাধা গোকুলে ফেরার পথ ধরে। কৃষ্ণ ও আশায় আশায় রাধার পাশ ছাড়ে না।

রাধা এভাবে তার ঐ মথুরার হাটে যাত্রাকালে কৃষ্ণকে ক্রমে বাগে এনে, তাকে বার-বার ব্যবহার করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে ঐ হাটে যাত্রার কারণেই। রাধা ঐ হাটের পথে পা বাড়িয়েছে বলেই কৃষ্ণ যেমন তার মন চুরি করতে পেরেছে, ঠিক তেমনি হাটে যাত্রার কারণেই রাধা-কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। আলোচ্য এই 'ভারখন্ডে' যেমন ভার বইয়ে নিয়েছে; তেমনি পরবর্তী 'ছত্রখন্ডে' ঐ হাটের পথে যাত্রাকালে রাধা কৃষ্ণকে দিয়ে তার মাথায় ছাতা ধরতেও বাধ্য করেছে। প্রথমে কৃষ্ণ যেমন রাধাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তেমনি রাধাও উল্টে কৃষ্ণকে দিয়ে কাজ

করিয়ে নিয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের ঐ দ্বন্দ্ব আর, মন দেওয়া-নেওয়ার ঐ প্রণয় মধুর সম্পর্ক স্থাপনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে – গোপ-গোয়ালিনী ঘরের বধু হিসাবে রাধার ঐ হাট জীবন। 'ছত্রখন্ডে' তাই দেখা যায় - হাটে দধি-দুধ বিক্রি শেষে বাড়ী ফেরার পথে, পথশ্রান্ত রাধা ও বড়াই তরুতলে বসে বিশ্রাম নেয়।

'এহে। দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকনিআঁ রঙ্গে।
পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।।'
(২০৬ সংখ্যক পদ)

এই খন্ডে রাধার আচরণ কৃষ্ণকে যে কেবল নিরাশ করেছে তা নয়; ঐ মথুরা নগরে রাধার হাতে কৃষ্ণকে অনেক বিড়ম্বনাও সহ্য করতে হয়েছে। মিথ্যা মিলনের আশ্বাস দিয়ে ভার বহন করিয়েছে। সবই সম্ভব হয়েছে রাধার ঐ হাট যাত্রার অনুসঙ্গেই। তাই এই খন্ডে দেখা যায়, রাধা ছল করে কৃষ্ণকে বলেছেঃ

'ছত্র ধর কাহ্ঞিঁ দিবোঁ সুরতী।'

এভাবে, হাটের পথে কৃষ্ণকে উল্টে কতই না বিড়ম্বনায় ফেলেছে রাধা। আসলে, এতদিনে রাধাও জেনে ফেলেছে কৃষ্ণের দুর্বলতা কোথায়। তাই সুযোগ বুঝে উল্টে রাধাও কৃষ্ণকে বিপাকে ফেলেছে। তাইত 'ছত্রখন্ডে' এসে কৃষ্ণ আর রাধার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভোলেনি। বরং উল্টে রাধাকে 'দানে'র অজুহাতে চেপে ধরেছে। 'দান' না নিয়ে কৃষ্ণ কিছুতেই রাধাকে আর পথ ছাড়তে রাজী নয়। তাই কৃষ্ণ জানিয়ে দিয়েছে –

'হাটে দান দেহ এ বাটে বহী।
ঠেঁটা দানে কেহ্নে বিচিবেঁ দ'
(১০১/১) হী।।

এভাবে 'দান' নিয়ে 'দানখন্ডে' রাধা-কৃষ্ণের তর্ক জমে ওঠে। রাধার কাছ থেকে সুরতির আশাও ছেড়ে দিয়েছে কৃষ্ণ। কারণ, রাধার ছলও কৃষ্ণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। তাই সে স্পষ্ট ভাষায় রাধাকে বলেছেঃ

'হাট বাট দান লিখন নেহ।
যে দান দিবেঁ সে দান দেহ।।'
(২০৯ সংখ্যক পদ)

কৃষ্ণও মিথ্যা পঞ্জিকা বের করে ছলনার দ্বারা রাধাকে জানায় তার কত দান বাকী রয়েছে। আজ কৃষ্ণ সেই সব দান পৃথক-পৃথক ভাবে নেবে।

'হাটের বাটের দান চাহে ভীনে ভীনে।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমানে।।'
(২১০ সংখ্যক পদ)

রাধাও তর্কে কম যায় না; ভার বহন কালে কৃষ্ণ তার অনেক দধি, দুধ নষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক করে ভার নিয়ে যেতে পারেনি। ভার চলকে অনেক দধি-দুধ পথে ছড়িয়ে পড়েছে। এত দধি-দুধ নষ্ট করার পরও কৃষ্ণ আর কি করে দান চাইতে পারে ? বরং উল্টে রাধা ঐ দধি, দুধ নষ্ট করার অর্থ দাবী করেছে। ঐ নষ্ট হয়ে যাওয়া দধি-দুধের দাম থেকে কৃষ্ণ তার ভার বওয়ার প্রাপ্য মজুরী কেটে নিয়ে বাকী অর্থ ফেরৎ দিক। এভাবে রাধা কেবল কৃষ্ণকে বিপাকে ফেলেই ক্ষান্ত নয়। পরদিন মথুরার হাটে প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে দধি-দুধ বিক্রি করতে গিয়ে কৃষ্ণকে দিয়ে তার মাথায় ছাতা ধরাতে চেয়েছে। সেই মতলবে রাধা বড়াইকে পাঠিয়ে বলেছেঃ

'আপন মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে। তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে।।'

আপনে বোলহ বড়ায়ি দেব গদা ধরে। ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে।।'

ঘৃত দধি-দুধ বড়ায়ি সাজি আঁ পসার।
(২১২ সংখ্যক পদ)
দধি বিকনী লআঁ হাটে মথুরার।।' –

সুতরাং, আবারও আলিঙ্গন দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে রাধা ঐ প্রখর রৌদ্রে কৃষ্ণকে দিয়ে মাথার ছাতা ধরাতে চেয়েছে। কিন্তু রাধার ঐ ছলনার জন্য কৃষ্ণকে ইতিমধ্যে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। মিলনের আশ্বাসে ইতিপূর্বে তাকে দিয়ে ভার বহন করিয়েও শেষ পর্যন্ত নিরাশ করেছে। তাই রাধা পুণরায় একইভাবে যখন বলেঃ 'ছত্র ধরো কাহ্ঞিঁ

দিবোঁ সুরতী।' তখন কৃষ্ণ বুঝে নিয়েছে যে এবারও রাধা তাকে ছলনা করেছে। তাই আর নয়। এমনকি, বড়াইও রাধার হয়ে তার প্রলোভনের কথা তুলে ধরলে তবুও কৃষ্ণের মন গলেনি। বরং ঐ ছাতা ধরা তার কাছে এক বিরাট অপমানের কাজ। কৃষ্ণ তাই রাধাকে বলেছে ঃ

'আহ্মা ছাতী ধরাই আঁ কি সাধিবে মান।
সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় অপমান।।'
(২১৪ সংখ্যক পদ)

'ছত্রখন্ডে'র শেষ অংশের পুঁথি পাওয়া যায়নি। তাই রাধা-কৃষ্ণের ঐ দ্বান্দিক ঘন মধুর সম্পর্ক স্থাপনের নাটকীয় কাহিনীতে যেভাবে হাট অনুসঙ্গ ধরা পড়েছে তা আর এই 'ছত্রখন্ড'থেকে বেশী না জানা গেলেও কৃষ্ণকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত রাধা যে তার মাথায় ছাতা ধরাতে পেরেছিল তা পরবর্তী খন্ডের কাহিনী থেকে স্পষ্ট জানা যায়। এই 'ছত্রখন্ড'কে কেন্দ্র করে কবির ভূখন্ড চিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করে বলেছেন, —

'ছত্রখন্ড পর্যন্ত কবি যে ভূখন্ড রচনা করেছেন তার অবস্থান একরকম, ছত্রখন্ড পরবর্তী ভূখন্ডের অবস্থান ভিন্ন।' - অর্থাৎ সমালোচকের মতে ঐ মথুরার হাটের উদ্দেশ্যে রাধার যে যাত্রা, সেই হাট বৃন্দাবন পেরিয়ে নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন —

'কাহিনীর প্রথম স্তরে (ছত্রখন্ড পর্যন্ত) যমুনা পেরিয়ে রাধা মথুরার হাটে আসে, দ্বিতীয় স্তরে (ছত্রখন্ড পরবর্তী) যমুনা পেরিয়ে রাধা বৃন্দাবনে আসে।'

- তারাপদ মুখোপাধ্যায় / বিশ্বভারতী পত্রিকা - ১৩৫৮

সুতরাং, রাধার কণ্ঠে তাই শোনা গেছে- 'ওকুলেতে মথুরা মাঝে যমুনা নদী।' ঐ যমুনা নদী পেরিয়ে হাটে যাত্রাকে কেন্দ্র করেই রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যত দ্বন্দ্ব-মধুর প্রণয় লীলা সংঘটিত হয়েছে। হাটের মাঝে কোনো ঘটনা সংঘটিত না হলেও, গোপ-গোয়ালিনী ঘরের বধু হিসাবে রাধার সংসারের প্রতি দায় এবং দায়িত্ব হেতু ঐ হাটের পথে যাত্রা এবং যে হাটের ওপর নির্ভর করেছে সমগ্র বৃন্দাবনবাসী নর-নারীর জীবন-জীবিকা। ঐ মথুরার হাটই বৃন্দাবনবাসীর জীবন-ধারণের প্রাণকেন্দ্র। তাই হাটের পথে রাধা না পা বাড়ালে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ঐ নাটকীয় দ্বন্দ্ব মধুর কাহিনী ঘটা সম্ভব হত না।

'বৃন্দাবন খন্ডে' গিয়ে দেখা যায় রাধা দীর্ঘদিন আর মথুরার হাটে দধি দুধ বিক্রি করতে আসেনি। তাই রাধাকে দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বড়াই গিয়ে কৃষ্ণের ঐ ব্যাকুলতার কথা রাধাকে বললে, রাধার মনেও সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। সকল গোপী মিলে পরামর্শ করে, কিভাবে রাধাকে হাটের পথে বের করে আনাা যায়। তাই তারা রাধার শাশুড়ী তথা, আইহনের মায়ের কাছে যায়, অনুমতি আদায়ের জন্য। গোপীগণ তিরস্কার পর্যন্ত করে অভিমন্যু জননীকে বলেছে, —

'দধি (১১৩/২) দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ।
এবেঁ গোয়ালার গেল জীবন উপাএ।।
তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলা হোঁ একমতী।।
আপন আপন বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পানি না খাইব।।'
- (২১৮ সংখ্যক পদ/পৃঃ ৩০১)

অর্থাৎ, হাটে যদি দধি-দুধ-ঘৃত-ঘোল না বিক্রি করতে যায়, তাহলে গোয়ালার জীবন, এমনকি জাত-ধর্ম কিভাবে রক্ষা হবে ? গোয়ালা জাত হয়ে যদি না জাত ধর্ম পালন করে, তাহলে আজ থেকে আমরা সকলে মিলে একমত হয়েছি যে, নিজ-নিজ ঘরের বধুকে হাটে পাঠাব। আর তোমার বধুকে যদি হাটে না পাঠাও, তাহলে তোমার ঘরে কখনো অন্নজল গ্রহণ করবো না। এমন কথায় রাধার শাশুড়ী ভয় পেয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে পুত্রবধূ রাধাকে হাটে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলেছে, -

'কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মধুরা নগর।'

আইহন জননীর অনুমতি পেয়ে বড়াই , -

'দধি-দুধ-ঘৃত-ঘোল (১১৪/২) সাজিআঁ পসারা।

রাধা সঙ্গে চলি যাই হাট মথুরা।।'

(২২০ সং পদ)

বড়াই, কৃষ্ণ সম্পর্কে ভয় ঘোচাতে সখীদের বুঝিয়ে বলেছে, কৃষ্ণ এখন হাটদান, বাটদান, ঘাট দানের অধিকার ত্যাগ করে কেবল বৃন্দাবনে থাকে। কাউকে খারাপ কথা বলে না। হাটের লোকেদের এখন সে ফুল ফল দিয়ে তুষ্ট করে। এমনকি, যমুনার ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সুতরাং এমন সুন্দর চরিত্রের কানাইকে দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এই সঙ্গে আবার বড়াই মুখে বৃন্দাবনের কথা শুনে সমস্ত গোপ যুবতী –

'বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী।'

এই বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়ে এই খন্ডের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। গোপ গোয়ালিনীর হাট যাত্রাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী তা এই খন্ডের পর আর তেমন ভাবে দেখা যায়নি। একেবারে 'বানখন্ডে' গিয়ে কেবল দেখা যায়, রাধাকে পুণরায় মথুরার হাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বড়াইয়ের উদ্যোগের ছবি। কৃষ্ণকে পথে রেখে বড়াই এবার রাধাকে ঘর থেকে ঐ হাটের পথে বের করার জন্য ছল করে বলেছে।

'বুইল তোহ্মে কি কাম করহ। আল এবেঁ কেহ্নে হাটক না জাহ।। ল রাধা।।

দুধ-দধি ঘরে রাখ কেহ্নে। আল। রাজপদ কি পাইল আইহনে। ল রাধা।।'

ঝাঁট করি সাজহ পসারা। দধি বিকে জাইউ মথুরা।।

ঝাঁট যবে হাটক জাইএ। তবেঁ লভেঁ পসার বিচিত্র।। – (২৮৫ সংখ্যক পদ)

এভাবে, বড়াই বার বার করে রাধাকে ঘর থেকে মথুরার ঐ হাটের পথে টেনে নিয়ে গেছে। আর তার ফলে সম্ভব হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে তার ঐ দ্বন্দ্বমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠা। এই খন্ডেও তাই দেখা গেছে, বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় রাধা, 'দধির পসরা ল আঁ মথুরা চলিলী।।' – (২৮৬ সংখ্যক পদ)। কৃষ্ণ ও বড়াইকে দিয়ে আইহন পত্নী রাধাকে ঘর থেকে বের করে এনে – পরস্ত্রীকে বার বার বিপর্যস্ত করে তুলেছে। রাধার ঐ হাটের পথে যাত্রাকালে বার বার কৃষ্ণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাধার তাই মথুরার হাট যাত্রার পথে একমাত্র ভয়ের কারণ ঐ কৃষ্ণ। রাধার চোখে কৃষ্ণ যেন এক লম্পট, ধূর্ত পুরুষ। বড়ু চন্ডীদাস কৃষ্ণকে এরূপ একটি ছল চতুর, কামনা-লোলুপ-দুষ্ট গ্রাম্য বালক রূপে এঁকেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক, অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু তাই ঐ কৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন –

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়াছে রাধা।

যাহার নাম কীর্তন করিতে কাব্যটির রচনা সেই কৃষ্ণই উহার

দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।'

আর এর যতকিছু আকর্ষণের কারণ ঐ কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে গতিদানকারী হিসাবে স্থানলাভ করে থাকা ঐ হাট অনুসঙ্গের জন্যেই। একদিকে বড়াইয়ের মধ্যস্থতা অপর দিকে সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতার হাল ফেরাতে রাধার ঐ সখীসহ হাটযাত্রা – এই উভয় কারণেই রাধা-কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হয়েছে। আর ঐ হাট যাত্রার অনুসঙ্গে ঘটে যাওয়া ছবিগুলি এত মোহনমুগ্ধ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রাধার জীবনে যতকিছু দুর্নাম, যতকিছু কলঙ্ক জুটেছে, তা ঐ তার হাট যাত্রার কারণেই। হাটের পথে পা বাড়িয়েই রাধা হয়েছে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী। কৃষ্ণ উপর্জুপরি রাধাকে বার বার ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। এমনকি 'বংশীখন্ডে' দেখা যায় রাধাকে বিপাকে ফেলার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা বাঁশি চুরির দায় চাপিয়েছে। কৃষ্ণের বার বার এমন ছল-চাতুরীর কাছে রাধা হার মেনে বড়াইকে তার ঐ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছে। বড়াই-র পরামর্শে রাধা যতবার দধি-দুধ নিয়ে হাটের পথে পা রেখেছে, ততবারই ঐ ধূর্ত কৃষ্ণ তার পথ রোধ করেছে। আজও তেমনি ঐ

বাঁশি চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে বিপাকে ফেলতে চেয়েছে। বড়াইকে তাই অনুযোগের সঙ্গে বলেছে ঃ

'ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী ।।

আঞ্চলে ধরি আঁ মোককা (১৮০/২) হ্নাঞি রহা এ গো।

বোলে তো এঁ বাঁশী কৈলী চুরী ।।'

– (৩৩৩ সংখ্যক পদ)

এভাবে, বাঁশি চুরি নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কলহ শুরু হয়। আসলে, কৃষ্ণকে শাস্তি দিতেই রাধা সত্যি-সত্যিই কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করেছে। বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় এবং কৃষ্ণের সকাতর অনুরোধে রাধা শেষ পর্যন্ত ঐ বাঁশি ফিরিয়ে দেয়। সমগ্র কাব্য-কাহিনীর একেবারে শেষ অংশ তথা, 'রাধা বিরহ খন্ডে' গিয়ে দেখা যায় – কেবল ঐ দধি-দুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়, কৃষ্ণের সন্ধানেই রাধা মথুরার পথে পা বাড়িয়েছে।

'কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরাপুরী নানা গিরী কন্দর বনে।

চল তোঁ মথুরা পুরী (১৯৫/১) তথাঁ তোকে পাইবে হরী....' (৩৫৮ সংখ্যক পদ)

সুতরাং কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধা সমগ্র মথুরা পুরীর গিরি কন্দর বনে খুঁজে ফিরেছে। এই খন্ডে কেবল মাত্র কৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কাহিনী মথুরা নগর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। রাধার ঐ মথুরার হাট যাত্রার উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত – অর্থের সংস্থান নয়; হাটে যাত্রার মূল লক্ষ্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ। তাই হাটে যাত্রার আছিলায় রাধা অকপটে বড়াইকে বলেছে ঃ

'দধি দুধে সাজাই আঁ চুকে।

সুন বড়ায়ি ল জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে।। না এ।।

আল হের। না বিকা এ যদি দুধ তথাঁ।

সুন বড়ায়ি ল। তভোঁ কাহ্নাঞিঁসমে হৈবে কথা।। না এ।।

আল হের। মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।

সুন বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে।। না এ।।'

– (৩৫৯ সংখ্যক পদ)

এভাবে, কৃষ্ণবিহনে রাধা ক্রমে আকুল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য রাধা যখন পাগল পারা, তখন কৃষ্ণ ও তার অতীত স্মৃতি চারণায় রাধাকে পাল্[illegible]জবাব দিয়ে বলেছে ঃ

'নিতি নিতি গোয়ালিনী গেলা দধি বিকে।
আনেক ভরাতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।।
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার।
তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার।।
যৌবন গরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ।
চাহিতে না ফুরে আর তোহ্মার মুখ।।'

– (৩৭৪ সংখ্যক পদ)।

অর্থাৎ, রোজ-রোজ গোয়ালিনী তুমি হাটে দধি বিক্রি করে গেলে। তোমাকে অনেক আকুল অনুনয় করেছি। আজ তুমি ভুলে গেছ ? তোমাকে যমুনা পার করে দিলাম, তোমার দধি ভার বহন করলাম। তবু তোমার মন তুষ্ট করতে পারলাম না। যৌবনের অহংকারে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছ। তাই তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। এভাবে কৃষ্ণ তার বিগত সব অপমানের পাল্[illegible] জবাব দিতে রাধাকে উপেক্ষা করে, সমগ্র গোকুল ছেড়ে কংস নিধনের উদ্দেশ্যে মথুরা যাত্রা করেছে।

বিরহ ব্যাকুলা রাধাকে গোকুলে ফেলে বৃন্দাবনের ঐশ্বর্যলীলার পর, কৃষ্ণ নতুন করে আবার মথুরায় শুরু করে মাধুর্যলীলা। পরবর্তী খন্ড গুলোতে আর ঐ হাট যাত্রার ছবি কিম্বা, হাট অনুসঙ্গ সেভাবে উঠে আসেনি।

বড়ুচন্ডী দাস যেহেতু এই কাব্য কাহিনীটি সাধারণের জন্য লিখেছেন, সেদিক থেকে এই কাব্যের রস আবেদনের কেন্দ্র মূলে সাধারণ জনের কাব্য হিসাবে ঐ 'হাট' জীবনের অনুসঙ্গ উঠে আসা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

তাই বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

'বড়ু চন্ডী দাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাঁর কাব্য লিখিয়াছেন বালয়িাই ইহার মধ্যে

নাটকীয় তা আরো তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে। ইহার কাব্যগুণকে ছাড়াইয়া

ইহার নাট্যগুণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।'

– ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর তা সম্ভব হয়েছে সমগ্র ঐ কাব্য-কাহিনীর গতিদানকারি হিসাবে এই 'হাট' যাত্রার অনুসঙ্গেই। যে হাট যাত্রার চিত্র ঐ লোক জীবনের অনুসঙ্গ হিসাবেই কাব্য-কাহিনীতে বার বার ধরা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যের এই আদি নাট্য-কাব্যের 'হাট' অনুসঙ্গের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক Inter Pretation দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। সমগ্র কাব্য-কাহিনীর আড়ালে যেমন একটা আধ্যাত্মিক দিক লুকিয়ে রয়েছে, তথা – 'দানখন্ডের' মধ্যে কৃষ্ণের দেহাকাঙ্খার অন্তরালে গীতার 'সর্বধর্ম সমর্পনে'র কথাই বিধৃত। আবার 'নৌকাখন্ডে' ভবনদীর কান্ডারী হয়ে ভগবান ভক্তকে এ জগৎ সংসার থেকে পার করতে চান। 'ভারখন্ডে' ভক্তের বোঝা ভগবান বইয়েছে। 'ছত্রখন্ডে' ভগবানের কৃপাচ্ছায়ায় ভক্তকে রক্ষা করার আশ্বাস ব্যঞ্জিত হয়েছে। তেমনি এই 'হাট' অনুসঙ্গের মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বসংসারটাই 'হাটে'র রূপকতায় উঠে এসেছে। সমগ্র এই বিশ্ব-সংসারটাই বেচা-কেনার মধ্য দিয়ে চলেছে। সবাই এখানে ক্রতা আর বিক্রেতা। 'হাট' জীবন তাই এই গোটা বিশ্ব-সংসার জীবন। রাধার যেমন রোজ-রোজ ঐ হাটের পথে পা রেখেছে; এই সমগ্র বিশ্ব-সংসারের প্রতিটি নর-নারীও তেমনি কোন না কোন হাটের পসরা সাজিয়ে বেচা-কেনার খেয়াল রোজ-রোজ মেতে ওঠে। আর তাই-ত-এই এই সমগ্র কাব্য কাহিনীর সূত্রপাত রূপে মথুরার ঐ হাট প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে একাধিক বার উঠে এসেছে। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাজ্ঞ সমালোচক যদিও বলেছেন,

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মথুরা, মথুরা নগর বা নগরী, কিংবা মথুরা হাট ইত্যাদির উল্লেখ পুনঃ পুনঃ থাকিলেও মথুরা নগর এই কাব্যের কোনো অংশেই পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। বৃন্দাবনই

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখ্য পটভূমি। এই ভূমন্ডলকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীটি সংঘটিত হইয়াছে।'

– অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (পৃঃ ১২৯)

ঐ ভূমন্ডল সমগ্র কাব্য - কাহিনীর পটভূমি না হলেও, 'হাট' প্রসঙ্গই যে এই কাব্যের কাহিনীকে নাটকীয় ভাবে গতিদানে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাট যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে নায়িকা রাধার ঘর ছেড়ে পথে নামার কারনেই কৃষ্ণের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বঘন প্রণয় সম্পর্কের সূত্রপাত। হাটের পথে যাত্রা অর্থে এক সময় বিশ্বাস ছিল বর্হিবিশ্বের সঙ্গে পরিচয় লাভ। সেকালে হাটের মধ্যদিয়ে পরস্পরে যোগাযোগ, ভাবের আদান প্রদান ঘটতো। তথা, হাটের মধ্যেই পত্র বিনিময় সহ সংবাদ আদান-প্রদান ঘটতো। পুর নারীদের বর্হিবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে 'হাট' কে দেখেছে সমাজ। চৈতন্যদেব 'হাট' কে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মূলকেন্দ্র হিসাবে দেখেছেন। শ্যামানন্দের শিষ্য উদ্ভব বৈষ্ণব ধর্মের বড় প্রচারক।'হাট' কে প্রথম ব্যবহার করেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনিই প্রথম 'হাট' কে কৃষ্ণ যাত্রা প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেন। এমনকি, সাম্প্রতিক কালেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রচার কেন্দ্র হিসাবে 'হাট' কে ব্যবহার করে থাকেন।

বড়ু চন্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের এই 'হাট' অনুসঙ্গের প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও, পরোক্ষ ভাবে পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যের যত্রতত্র লক্ষ্য করার মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৮৪) সহ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌঠাকুরানীর হাট'' (১৮৮৩) এমনকি, তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়ের 'ভূবন পুরের হাট' (১৯৬৪)ও 'কীর্তি হাটের কড়চা'

(১৯৬৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাট' গল্পসহ বনফুলের 'হাটে বাজারে'(১৯৬১),- সমরেশবসুর 'চন্দন ডাঙার হাট' এছাড়া, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'চরকাশেন' (১৯৪৯) সহ এমন অসংখ্য গল্প-উপন্যাসের কাহিনী সূত্রেও ঐ 'হাঁট' অনুসঙ্গ ধরা পড়েছে। ঠিক তেমনি বড়ু চন্ডীদাসের এই সমগ্র কাব্য - কাহিনীর অনুসঙ্গে ঐ হাট যাত্রার প্রসঙ্গটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ রূপে অবস্থান করেছে, তা এই কাব্য - কাহিনীর আদ্যন্ত পাঠেই স্পষ্ট হয়েওঠে। ঐ 'হাট' অনুসঙ্গের মধ্যেই জড়িয়ে রয়েছে তৎকালীন গোপ-গোয়ালাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান। তাদের জীবন - জীবিকা ও তৎকালীন সমাজ জীবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি। এপ্রসঙ্গে তাই, কেবল ঐ 'হাট' অনুসঙ্গই নয়; বিশিষ্ট সমালোচক কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে মন্তব্য করে তাই বলেছেন,-

'চন্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস,-বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদ সাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।' - রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

গ্রন্থঋণ :-

১/ বড়ুচন্ডীদাসের - শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র
- অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য। দে'জ।
২/ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড)
- সুকুমার সেন। আনন্দ।
৩/ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড)
- সুকুমার সেন। আনন্দ।
৪/ বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
মডার্নবুক এজেন্সি প্রা:লি:।
৫/ বিভূতি ভূষণ গল্প সংগ্রহ, প্রথম খন্ড
- জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
৬/ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
- তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- প্রজ্ঞা বিকাশ।